অভিশপ্ত সাপঃ মেঘালয়ের খাসি জনগোষ্ঠীর উপকথা ও হিংসাশ্রয়ী তন্ত্রবিদ্যা

মেঘমালা দে মহন্ত
নেহরু কলেজ, কাছাড়, আসাম

স্বর্গের আলয় থেকে...

ইহুদি বিধাতা ইয়াহে (Yahweh) তাঁর সৃষ্টির শুরুতে ইভ আদমেরও আগে সমস্ত প্রানী, জীব-জন্তুদের মধ্যে সাপকে গড়লেন শ্রেষ্ঠ সর্বাঙ্গ সুন্দর,মহা শক্তিধর দ্বিপদ করে ।তারপর যখন তিনি সৃষ্টি করলেন ইভ এবং আদমকে তখন দেবতাদের অনেকেরই তাদের পছন্দ হলনা ।তাই তাঁরা চক্রান্ত করলেন তাদের বিলুপ্ত করে দেবার। এদিকে ইভকে দেখে কামাতুর সাপ দেবতাদের আদমকে হত্যার বিনিময়ে ইভকে পাবার প্রস্তাব দেয়। দেবতারা রাজি হলে সাপ রোজ ইভের কাছে আসে–ভাল ভাল কথা বলে, তার তারিফ করে এবং অনুরাগ- আরক (Love-potion) খাওয়ায়। কিন্তু সহজে ভোলাতে পারে না। একদিন সাপটা ইভকে নিয়ে যায় ইয়াহের বাগানের সেই গাছের নীচে যার ফল ইয়াহে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন তার সৃষ্ট সমস্ত প্রানীদের জন্য। সাপ ইভকে কে প্ররোচিত করে সেই গাছের ফল খাওয়ায় এবং নিজেও খায়। ফল খাওয়ার পর নেশাচ্ছন্ন ইভ লক্ষ্য করে তার অনাবৃত শরীরের দিকে কামাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাপ। নিজের অনাবৃত দেহের জন্য প্রথম লজ্জার অনুভূতি জাগে ইভের মধ্যে। দৌড়ে একটা ঝোপের পেছনে নিজেকে লুকোয় ইভ। সাপটাও ক্রমশ এগিয়ে আসে ইভের দিকে। নিজেকে বাঁচাতে ইভ চীত্কার করে আদমকে ডাকে। ইভের ডাকে ছুটে আসে আদম । সমস্ত ঘটনায় বিস্মিত আদম সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল সমস্ত প্রানীদের খাওয়ায় এবং নিজেও খেয়ে প্রস্তুত হয় ইভের সহযাত্রী হতে । ইভ,আদম এবং সাপের এই আচরণে বিরক্ত ইয়াহে তাদের বহিস্কৃত করলেন স্বর্গ থেকে , আর সাপকে তার সমস্ত সৌন্দর্য কেড়ে নিয়ে পদবিহীন করে দিলেন ।

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত ইভ আদম যখন পৃথিবীতে পরিত্যক্ত একটা গুহায় বাস করছিল তখন প্রতিহিংসার নেশায় সেখানে হাজির হয় সাপ এবং ইভ- আদমকে একসাথে জড়িয়ে ধরে ছোবল দেবার জন্য । ইয়াহে তখন সেখানে হাজির হয়ে তাঁর পুত্র- কন্যাদের রক্ষা করেন সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে এবং সাপকে অভিশাপ দিয়ে কেড়ে নেন তার বাক-শক্তি। (The book of Genesis, 3:1-20)

মেঘালয়ের কোলে...

ভারতের উত্তর- পূর্বাঞ্চলে মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে প্রচলিত খাসি লোক- কথা,লোক- বিস্বাস এবং ততসম্ভূত তন্ত্র চর্চায় দেখা মেলে সেই শাপ- গ্রস্থ সাপের ।তারা বিশ্বাস করে ইয়াহের অভিশাপের সঙ্গে আসে প্রচন্ড ঝড় এবং ঝড়ের দাপটে সাপ উড়ে এসে পড়েছিল ভারতবর্ষে।

Bhatter College Journal of Multidisciplinary Studies, (ISSN 2249-3301), Vol. III, 2013. Ed. Pabitra Kumar Mishra. Available online at: http://bcjms.bhattercollege.ac.in, published by Bhatter College, Dantan, Paschim Medinipur, West Bengal, India. www.bhattercollege.ac.in. © Bhatter College, Dantan
**To read or print the article, download Avro Keyboard from www.omicronlab.com/avro-keyboard.html*

তাদের লোককথায়, চেরপুঞ্জির শোরা অঞ্চলের রংজিরতেহ (Rongjrteh) গ্রামে পাহাড়ি রাস্তার ধারে একটা গুহায় বাস করত এক বিশাল সর্প-দানব থ্লেন (Thlen)। দেবতার অভিশাপ অনুযায়ী বে- জোড় সংখ্যার শিকারে বারণ ছিল থ্লেন এর ।আর তাই গরু,ছাগল, হরিণ,মানুষ যা- ই দলবদ্ধ ভাবে যেত থ্লেন তার অর্ধেকটা গিলে ফেলত । তাই মানুষরা চেষ্টা করত বেজোড় সংখ্যায় দলবদ্ধ ভাবে সেই পথে যাবার। ক্রমশ থ্লেন এর শিকারের ভয়ে ওই পথে মানুষের যাতায়াতই দুষ্কর হয়ে পড়ে। অসহায় গ্রামবাসীরা তখন শরনাপন্ন হয় ঈশ্বরের ।লাইত্রেংগু (Laitryngeu) গ্রামের এক দুঃসাহসী যুবক সুইডনহ (Suidnoh)-কে ঈশ্বর তখন ভার দেন থ্লেন-কে হত্যা করার। সাহসী,বুদ্ধিমান সুইডনোহ সানন্দে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে হাজির হয় থ্লেন এর গুহায়। স্বাস্থ্যবান সুইডনোহকে দেখে থ্লেন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিন্তু অভিশাপের শর্ত অনুযায়ী যেহেতু সুইডনোহ একা (বেজোড়) তাই কিছুই করতে পারেনা। সুইডনোহ তখন থ্লেনকে প্রচুর শুকরের মাংস দিয়ে খুশি করে এবং তারপর থেকে রোজই এভাবে নানা পশুর মাংস খাইয়ে থ্লেন এর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে ।সুইডনোহ- র দেওয়া খাবারে অভ্যস্ত থ্লেন ক্রমশই কুঁড়ে হয়ে ওঠে । ইতিমধ্যে সুইডনোহ এক বিশাল চুল্লি প্রস্তুত করে গুহার মুখে। একদিন সুইডনোহ একটা লোহার শলাকা সেই চুল্লিতে পুড়িয়ে টক্‌টকে লাল করে একটা বড় চিম্‌টে দিয়ে ধরে নিয়ে এল থ্লেন এর কাছে। শলাকাটা দেখিয়ে সুইডনহ থ্লেন- কে বল্ল এক অসাধারণ সুস্বাদু খাবার সে আজ এনেছে এবং সে নিজের হাতে সেটা থ্লেনকে খাইয়ে দেবে। কুঁড়ে,লোভী থ্লেন সুইডনোহ- র কথায় মুখ খোলে খাবার জন্য। সুইডনোহ বিদ্যুত গতিতে গোটা শলাকাটা পুরে দেয় থ্লেন এর মুখের ভেতরে। যন্ত্রণায় আর্তনাদে, বিশাল দেহের আলোড়নে কেঁপে ওঠে গোটা অঞ্চল । বহুক্ষণের হৃদয়- বিদারক দাপাদাপি শেষে একসময় স্তব্ধ হয়ে যায় থ্লেন- এর বিশাল দেহ। থ্লেন- এর মৃত্যুর খবরে গোটা গ্রাম উঠে আসে গুহার মুখে। সুইডনোহ ঘোষণা করে থ্লেন এর দেহ কেটে ভোজ হবে গোটা গ্রামে। মৃত থ্লেন এর শরীরের এক টুক্‌রোও যেন অবশিষ্ট না থাকে। সুইডনোহ- র নির্দেশ অনুযায়ী মৃত থ্লেন এর বিশাল মৃতদেহ গ্রামবাসীরা টেনে নিয়ে যায় একটা শুকনো নদীর ওপর। সেখানে থ্লেন এর দেহ টুক্‌রো টুক্‌রো করে বিলিয়ে দেয়া হয় গ্রামবাসীদের মধ্যে ভোজের জন্য। সেই শুক্‌নো নদীটি কে তারপর থেকে বলা হয় দাইন্‌থ্লেন (Dainthlen) অর্থাৎ যেখানে থ্লেনকে কাটা হয়েছিল। খাসি বিশ্বাস অনুযায়ী তারপর থেকে সেই শুক্‌নো নদীর পাথরগুলির আকৃতি হয়ে যায় সাপের শরীরের কাটা টুক্‌রোর মত।

থ্লেন এর মাংসে ভোজ সারে গোটা গ্রাম। শুধু এক বৃদ্ধা কিছু মাংস ঝুড়িতে তুলে রাখেন তাঁর ছেলের জন্য- যে সে সময় বাড়িতে ছিলনা। ছেলে বাড়িতে ফিরে আসার পরও বৃদ্ধা কিন্তু ভুলে যান সেই মাংসের কথা। পরদিন বৃদ্ধা শুনতে পান সেই ঝুড়ি থেকে কে যেন বৃদ্ধাকে ডাকছেন। কাছে গিয়ে ঢাকা সরিয়ে বৃদ্ধা দেখেন ঝুড়ির ভেতর রয়েছে একটা ছোট্ট সাপ। সেই ছোট্ট সাপ বৃদ্ধাকে বলে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে খাসি সম্প্রদায়ের শত্রু হয়েছ ।তবে ভয় নেই ,আমি তোমায় রক্ষা করব এবং প্রচুর অর্থের মালিক করে দেব। বিনিময়ে শুধু তুমি সময় হলে আমায় খাসি রক্ত উতসর্গ করবে। বৃদ্ধা রাজী না হলে থ্লেন তার নাতিকে মেরে ফেলে বাধ্য করে তাঁকে তাঁর নির্দেশ মানতে। সেই থেকে থ্লেন এর পূজোর পরম্পরা মেঘলয়ে জাঁকিয়ে বসে ।

আবার কেউ কেউ মনে করেন শুধু ওই বৃদ্ধাই নন আরো অনেকের ঘরেই পুনর্জিবীত হয়েছিল থ্লেন। কারণ ,থ্লেন এর মাংস পূর্ব খাসি পাহাড় আর পশ্চিম খাসি পাহাড়ের মানুষরা নিজেদের মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করে নেয়। পূর্বে জনবসতি বেশি থাকায় থ্লেন এর মাংসের কোন অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে না কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে তুলনামূলক ভাবে জনবসতি কম থাকায় থ্লেন এর মাংস গ্রামবাসীরা শেষ করতে পারে না, পড়ে থাকে অনেক এবং সেই পড়ে থাকা মাংসের প্রতি টুক্রোয় জন্ম হয় বহু থ্লেন এর। মেঘালায়ে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে,এই ছোট্ট থ্লেনরা সমস্ত বছর সুতোর আকৃতিতে রক্ষিত থাকে পরিবারের গৃহকর্ত্রীর কাছে,শুধু খাসি মানুষের রক্ত গ্রহণের দিন তারা বিরাট আকৃতি ধারণ করে। থ্লেন এর আশীর্বাদে প্রচুর বিত্তশালী হয় সেই পরিবার।

হিংসার বেদীমূলে...

থ্লেন এর উপাসক পরিবার (Menshohnoh) প্রতি বছরে একবার কিংবা দু'বার থ্লেন কে উৎসর্গ করার জন্য খাসি সম্প্রদায়ের একজন মানুষ ধরার জন্য লোক নিয়োগ করে। সেই লোকটিকে বলা হয় নংশোহনোহ (Nongshohnoh)। জরুরী নয় সেই নংশোহনোহকে খাসি হতে হবে। শর্ত থাকে শুধু, যেহেতু থ্লেনকে লোহার শলাকা দিয়ে মারা হয়েছিল সেই হেতু থ্লেন এর উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য খাসি মানুষটিকে মারার সময় নংশোহনোহ কোন লোহার অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবেনা।

সাধারণত দু'টি পদ্ধতিতে নংশোহনোহ তার শিকারের কাজটি করে থাকে ।প্রথম পদ্ধতিতে প্রচুর মদ্যপানের পরে নংশোহনোহ মন্ত্র পাঠ করে কিছু চাল এবং হলুদ মিশ্রিত করে। তারপর বেরিয়ে পড়ে খাসি মানুষ শিকারের উদ্যেশে। সঙ্গে নেয় সেই মন্ত্রপূত হলুদ চাল, রূপোর কাঁচি, তীক্ষ্ম ছুরি এবং একটা বাঁশের নল। একা কোন খাসি লোককে নির্জনে সুবিধেমত পেলে নংশোহনোহ আক্রমণ করে তাকে। শারিরীক নিগ্রহের পাশাপাশি খাসি বিশ্বাস অনুযায়ী লোকটিকে অজ্ঞান করার জন্য সেই হলুদমিশ্রিত মন্ত্রপূত চাল ছিটিয়ে দেয়। অতিরিক্ত শারিরীক নিগ্রহের কারণে কখনো কখনো মৃত্যুও হয় হতভাগ্য খাসি শিকারটির। তারপর রূপোর কাঁচি দিয়ে কেটে নেয় তার কাপড়, ভুরু, কানের লতি, হাত- পায়ের নখ,এবং ঠোঁট। তারপর নাকের ফুটোয় ছুরি ঢুকিয়ে রক্ত সংগ্রহ করে সেই বাঁশের নলে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কোন জনবহুল স্থানে নংশোহনোহ সুবিধেমত কোন খাসি মানুষের অজান্তেই রূপোর কাঁচি দিয়া কেটে নেয় অল্প চুল বা কাপড়ের টুকরো ।

মধ্যরাতে খুলে দেওয়া হয় ঘরের সমস্ত দরজা জানালা। ঘরের মেঝেতে পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে তার উপর রাখা হয় একটা পিতলের থালা। থালার উপর সাজিয়ে রাখা হয় নংশোহনোহ- র সংগৃহীত কোন খাসি লোকের নখ, ভুরু, ঠোঁট, কানের লতি অথবা রক্ত । তারপর একটা ছোট ড্রাম বাজিয়ে বাজিয়ে পরিবারের লোকেরা আহ্বান করে থ্লেনকে। গৃহকর্ত্রীর কাছে রক্ষিত তাবিজের মধ্য থেকে বেরিয়ে ছোট্ট থ্লেন বিরাট আকার ধারণ করে। মেঝেতে রাখা পিতলের প্লেটের রক্তে ফুটে ওঠে সেই খাসি মানুষটির অবয়ব, যার রক্ত,কাপড়, বা চুল উত্সর্গ করা হয়েছে থ্লেনকে । বিশাল থ্লেন ধীরে ধীরে পায়ের দিক্ থেকে গ্রাস করে সেই রক্তের উপর ভেসে থাকা অবয়বটি এবং সেই

মুহূর্ত পর্যন্ত যদি জীবিত থাকে সেই লোকটি ঢলে পড়ে মৃত্যুতে। পরিতৃপ্ত থ্লেনের আশীর্বাদে আরো সৌভাগ্যশালী হয় সেই পরিবার ।

পাপের তটিনী বেয়ে...

"২৭ এপ্রিল ২০১১ মেঘালয়ের মাওলিতে থ্লেন উপাসকের ঘর পুড়িয়ে দেয় গ্রামবাসীরা।" (মেঘালায় লহরী, ২৯ এপ্রিল ২০১১)

"মেঘালায়ের রাজধানী শিলং থেকে ৮কিঃমিঃ দূরে স্মিত গ্রামে ১৪ আগষ্ট ২০১৩ এক পরিবারের ইসেললি মাওথো, বেসলি মাওথো এবং ডি নংধোর এই তিনজন সদস্যকে ডাইনি সন্দেহে হত্যা করে প্রায় ২০০০ গ্রামবাসী। থ্লেন পূজারী এই পরিবারের লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁরা নাকি নানা আধিভৌতিক কার্যকলাপের পর ওই গ্রামের লাম্বা নোংরাম (২৫)-কে মারধোর করে নাক ও নখ কেটে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে যায় উমিউ নদির পাড়ে।" (দৈনিক যুগশঙ্খ, ১৬ আগষ্ট ২০১৩)

পরম্পরার আড়ে...

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত বোন রাজ্যের অন্যতমা সুন্দরী মেঘালায়। খাসি, গারো, জয়ন্তীয়া – তিন পাহাড়ী জেলার এই রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে ঘন বনাঞ্চল। রাজ্যে বাস করেন মূলত খাসি ,গারো, জয়ন্তীয়া, কোচ, বরো ,হাজং, কুকী, মিকির ইত্যাদি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা ৭০% ই অহিংস খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী। খাসিদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের কোন লিখিত লিপি বা ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থ নেই। কারণ, প্রচলিত লোককথা মতে তাঁদের পূর্বপূরুষেরা কোন এক চরম বন্যার দুর্যোগের সময় তাঁদের পবিত্র গ্রন্থটি রক্ষার কোন উপায়ন্তর না দেখে গিলে ফেলেন। এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা প্রকৃতি থেকেই খুঁজে নেন তাঁদের পবিত্র, সুন্দর,সত্য, ন্যায় এর শক্তিটি। অন্যদিকে হিংসা, ঈর্ষা, লোভ , অন্যায় ইত্যাদি জীবনের নেতিবাচক দিক গুলির প্রতীক থ্লেনকেও উদরস্থ করেছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষেরা। শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায়ের শক্তি খাসি বিস্বাস মতে তাঁরা পরম্পরাগত ভাবেই বহন করেন নিজেদের মধ্যে, শুধুমাত্র এই শক্তিগুলির সক্রিয়তার পরিমাণটি নির্ধারিত হয় পরবর্তী জীবন চর্যার মাধ্যমে আর সেখানে নির্ণায়কের এক বড় ভূমিকা পালন করে তাঁদের লোককথা, মিথ। এছাড়াও রয়েছে সেই অঞ্চল সংলগ্ন অন্যান্য জন গোষ্ঠীর রীতি নীতি আচার ব্যবহারের প্রভাব।

ভাষ্করবার্মার নিধনপুর লিপি অনুসারে মোটামুটি পঞ্চম শতকের শেষের দিকে তাঁর বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ভূতিবার্মা শ্রীহট্টে (পঞ্চগ্রাম)২০২জন ব্রাহ্মন বসতি করান। প্রথম ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে শ্রীহট্ট।এই ব্রাহ্মণদের দায়িত্ব ছিল জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে লাঙ্গল ভিত্তিক চাষের প্রবর্তন করা এবং জনজাতিদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আওতাভুক্ত করা। ষোড়শ শতক থেকে শ্রীহট্টের উত্তর প্রান্তের কানাইরঘাট এবং গোয়াইরঘাট নামের দু'টি পরগনা জয়ন্তীয়া রাজাদের দখলে ছিল। সেই সময়ে খাসিদের মধ্যে নদী পূজার বিশেষ প্রপচলন ছিল এবং তাঁদের প্রধান নদী দেবী ছিলেন কুপলি। এই

কুপলি নদী খাসিরা রাত্রিতে পার হতোনা এবং যখনি অতিক্রম করতেন তখন তারা তাঁদের সমস্ত পাপ স্বীকার করতেন। নরবলি এই কুপলি পূজার অঙ্গ ছিল –"In olden days , human victims were sacrificed to the Kopili goddess on the flat table stone (Maw Kynthi) at a place called Jew Ksih close to the Kapili river." (The khasis, by P.T.R.Gordon, page 151) পার্শ্ববর্তী জুক্‌সি-তেও এরকম কিছু পাথর রয়েছে। জয়ন্তীয়া রাজারা নব্য ব্রাহ্মণ্যধর্মে প্রভাবিত হয়েছিলেন যার ফলশ্রুতিতে নারটিয়াং এ কুপলি মন্দির নির্মাণ করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ করেন। তাঁদের প্রভাবেই ধীরে ধীরে দেবী কুপলিকে কালীর সঙ্গে এক করে দেখা শুরু হয়। পাশাপাশি খাসিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিস্তারের আরো একটি নিদর্শন হচ্ছে কুপলি মন্দিরের অনতি দূরেই নির্মিত হয় একটি শিব মন্দির এবং প্রতিষ্টিত করা হয় পাথর খন্ড। নরবলির আচার সংপৃক্ততার জন্য পাথরের সঙ্গে অলৌকিকতার ধারণাটি খাসিদের মধ্যে আগেই প্রোথিত ছিল।যার ফলে শিব মন্দিরকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রসারের কাজটি সহজ হয়ে যায়। কিন্তু এই মন্দিরে নরবলি প্রথাটি প্রবহমান রয়ে যায়। জয়ন্তীয়া রাজারা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে প্রভাবিত হলেও নিজেদের আদি সংস্কৃতির অনুগামি খাসিদের এক বড় অংশ আপোষ করেনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে এবং স্থান ত্যাগে বাধ্য হয়। কিন্তু ছেড়ে যাওয়া ভূমির টানে তাঁরা মাঝে মধেই রাতে হানা দিত বরাক তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে নরবলি উপাচার শিকারে। জনশ্রুতিতে এই নৈশ আক্রমণ দৈত্যের আক্রমণ বলে প্রচলিত ছিল। খাসি জনগোষ্ঠীর নানা উপশাখা খ্রিয়ম, প্লার , ভয়, মরাম , লিঙ্গম, ডিকো ইত্যাদিদের মধ্যে নরহত্যার পরম্পরাটি সুপ্রাচীন। অবাধ নরবলির এই দাপট কিছুটা স্তিমিত হয়েছিল ১৮৩৫ এ। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তত্কালীন দেশীয় সমতল জয়ন্তীয়া রাজা রাম সিংহের আমলে চারজন বৃটিশকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় (Statistical Account of Assam Vol.2 By W.W. Hunter) চারজনের মধ্যে তিন জন কে বলি দেওয়া হয় এবং একজন পালিয়ে আসেন। তারপর একই ঘটনার পুণরাবৃত্তিতে বিরক্ত বৃটিশ শাসক ১৮৩৫ এ সমতল জয়ন্তীয়া পরগণাকে শ্রীহট্ট বা সিলেটের অন্তর্ভুক্ত করে নরবলি নিষিদ্ধ ঘোষনা করে ১৮৩৫ এ বৃটিশ কর্তৃক জয়ন্তীয়া পাহাড়ের শ্রীহট্ট অন্তর্ভুক্তির ফলে পার্বত্য সমতল জনগোষ্ঠী সরাসরি সংস্পর্শে চলে আসে হিন্দু শক্তি চর্চার। জয়ন্তীয়া পাহাড়ের দক্ষিণে বাউরবাগ গ্রামে শ্রীহট্টের বিখ্যাত জয়ন্তেশ্বরী মন্দির একান্ন পীঠের একটি। সতীর বাম উরু ভাগের পীঠ বলেই সম্ভবত গ্রামটির নাম বাউরবাগ। সেখানকার উগ্র হিন্দু তন্ত্র চর্চা অচিরেই প্রবেশ করে জয়ন্তীয়া অঞ্চলে। শক্তি উপাসক এইসব ব্রাহ্মণদের তন্ত্রাচার গভীর ভাবে প্রভাবিত করে জয়ন্তীয়া, খাসি জনগোষ্ঠীর লোকেদের। সেই প্রভাব আরো গভীরতর হয় তত্কালীন শ্রীহট্ট, চট্টগ্রামে জাঁকিয়ে বসা বৌদ্ধ তন্ত্রচর্চার সংমিশ্রণে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠে সুদীর্ঘ কাল থেকে চলে আসা সর্প রক্ষক পোষনের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে খাসিদের থ্লেন উপাসনার। এই সর্প রক্ষক পোষনের বিস্তৃত বিবরণ মেলে ফা-হিয়েনের শানকাশ্য মঠের বর্ণনায়। ফা- হিয়েন লিখেছেন–

> "মঠে ভিক্ষুদের প্রত্যকের জন্য পৃথক ভাঁড়ার বা খাদ্য গ্রহণ ব্যবস্থা ছিল না। হীনযান, মহাযান উভয় পন্থীদের মধ্যেই এই একই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং সেইসব মঠগুলিতে মূল দানপতি বা পালকের ভূমিকাটি পালন করত সাদা কান বিশিষ্ট একটি ড্রাগন বা গোসাপের উপর। অকাল বর্ষণ, খরা এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সেই অঞ্চলকে রক্ষা করে শষ্য

ভান্ডার পূর্ণ করে ভিক্ষুদের নিশ্চিন্ত জীবন নিশ্চিত করত এই ড্রাগন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ভিক্ষুরা এই ড্রাগনের জন্য একটা ঘর তৈরি করে তাতে একটা গালিচা পেতে দিতেন এবং প্রত্যেকদিন তিনজন ভিক্ষু সেখানে যেতেন এবং ভোজন গ্রহন করতেন। ড্রাগনের পরিচর্যার জন্য নিয়োগ করা হত একজন পরিচর্যাকারীকে। গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ পর্যায়ে এই ড্রাগন রূপান্তরিত হত একটি ছোট সাদা সাপে, যার কানের দুপাশে ছোপ ছোপ দাগ থাকত। ড্রাগনের এই পরিবর্তিত রূপ চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুরা একটি তাম্র পাত্র মাখনে পরিপূর্ণ করে তাতে সেই ছোট্ট সাপটিকে রাখতেন। তারপর সেই পাত্রটিকে নিয়ে পর্যায়ক্রমে পরিক্রমা করতেন মঠের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী থেকে শুরু করে সাধারণ ভিক্ষুদের চারপাশে। এভাবে পরিক্রমা চলাকালীন সময়ে হটাত্ করে অদৃশ্য হয়ে যেত সেই সাপ।এভাবে বছরে চারবার করে অদৃশ্য হত সেই ছোট্ট সাপ এবং ড্রাগন হয়ে পুণরায় ফিরে আসত সেই ঘরে"। (*A Report of Buddhist kingdom—Account by Fa-Hien of his travels in India and Celoyne*. AD399-414 insearch of Buddhist books of decipline. Translated and annotated by James Legge . Chapter 49. Page 52)

ফা- হিয়েনের এই বর্ণনা অনুযায়ী এই ড্রাগন উপাসনার সাথে সঙ্গে থ্লেন উপাসনার সাদৃশ্যগুলি হচ্ছে, উভয়েই পালকদের উপাসনার বিনিময়ে ধন সম্পদ ফসল প্রাপ্তির ব্যাপারটি নিশ্চিত করে এবং উভয়েই উপাসনার সময়ে রূপ, আকার পরিবর্তন করে। পৃথিবীর নানা স্থানেই সাপ বা ড্রাগনকে উর্বরতা এবং সাপের খোলস পরিবর্তনকে আত্মার পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। সাপ, কুমীর, ড্রাগন মোটিফের সঙ্গে দৈবশক্তির যোগসূত্রটি মঙ্গোলীয় বিভন্ন জনগোষ্ঠীতে বহুল প্রচলিত। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই খাসি- সিন্টেংরা মূলত এক দলছুট মঙ্গোলীয় গোষ্ঠী।

বর্তমান বাংলাদেশের পার্বত্য জনগোষ্ঠী চাক্মা, মার্মা, খিয়াং, এবং বাঙ্গালি বড়ুয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের একটি বৃহদ্ অংশ বাস করেন শ্রীহট্ট প্রতিবেশী চট্টগ্রাম অঞ্চলে। এই জনগোষ্ঠীর একটি অংশ তুর্কী আক্রমণের প্রভাবে উত্তর প্রদেশ, বিহারের নালন্দা সংলগ্ন অঞ্চল থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ফা- হিয়েনের বর্ণনায় শাঙ্কাশ্য মঠে যে সর্প রক্ষকের উল্লেখ রয়েছে তার চর্চা যে এই অঞ্চলের বৌদ্ধ মঠগুলিতেও সেসময় ছিল বা পরবর্তীতে বর্তমান উত্তর প্রদেশ, বিহার থেকে আগত ভিক্ষুদের মাধ্যমে কুমিল্যা, চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল তা যুক্তি সঙ্গত ভাবেই ধরে নেয়া যায়। কিন্তু তাঁদের এই আগমনের অনেক আগে থেকেই যে শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ইত্যাদি অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন ব্যাপক ছিল তার প্রমাণ মেলে পাহাড়পুর ,ময়নামতী ইত্যাদি স্থানে ৮ম ৯ম শতকের বৌদ্ধ স্তুপগুলির আবিষ্কারে ।ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বজ্রযানী সাধন-চর্চার অন্তিম কেন্দ্রগুলির একটি ছিল শ্রীহট্ট। তথ্যের সমর্থন হিসেবে 'সাধনমালা'- র সম্পাদক বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের উক্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে-

"The reference of the Sadhanmala makes it evident that the four Pithas Kamrupa, Shrihatta, Purnagiri, and Uddiyan were specially sacred to Vajrayana and in all probability at all these places the deity was installed in a temple " (Home of tantrik Buddhasim. B.c Law volume. Page-357)

বৃটিশ সরকারের ঘোষিত নিষিদ্ধ নরবলি প্রথা পরবর্তীতে এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল জয়ন্তীয়া, খাসি, গারো পার্বত্য অঞ্চলে ।যে নরবলি সেখানে মূলত ছিল শৌর্য, বীরত্ব এবং কিছু কিছু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অঙ্গ সেই নরবলি সংযুক্ত হয়ে যায় শক্তি, সম্পদ,ঐশ্বর্য, ক্ষমতা লাভের উপাচারে। নারটিয়াং দুর্গা মন্দিরে বলি প্রথা, বৌদ্ধদের সর্প রক্ষক উপাসনা –এ সমস্ত কিছুর সংমিশ্রণে খাসি জয়ন্তীয়া পাহাড়ে লোককথা, মিথের আবরণ ভেঙ্গে থ্লেন পুনরুজ্জিবীত হয় মানুষের ক্রমবর্ধমান লোভ , ঈর্ষা , হিংসার পুষ্টিতে।

শুধু থ্লেন নয়, গোটা মেঘালয় জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন তন্ত্র- মন্ত্রের চর্চা। কা- টারো, কা- ভি, কা- শোর, কা- লাসাম, কা- তাম্পিয়াম –এ সমস্তই বিভিন্ন মেঘালয়ের লোকবিশ্বাস- জাত নানা উপাস্য এইসব আধিভৌতিক কার্যকলাপের প্রতি তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের এক ধরণের ভয় মিশ্রিত অবজ্ঞা পরোক্ষভাবে পুষ্ট করে চলেছে এসবের প্রায়োগিক ধারাটি। যখনি স্মিথ গ্রামের মত কোন ঘটনা প্রকাশ্যে আসে তখন সেই ঘটনার পুরো দায়টি চাপান হয় ‘কুসংস্কার’ নামের বিদ্যায়তনিক শব্দটির ওপর। সযত্নে পরিহার করা এই কুসংস্কারের উত্স সন্ধানের প্রয়াস। সমস্যার সহজ সমাধান হিসেবে কুসংস্কার দূরীকরণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কার্যকলাপ বিরোধী কঠিন আইন প্রনয়নের দাবিও ওঠে এবং এ সমস্ত সমাধানের কথা ভাবা হয় শুধুমাত্র সেই সমস্ত গোষ্ঠী বা পরিবারের কুসংস্কারের কথা ভেবে যারা কোন নৃশংষ ঘটনার পর আবেগের বশবর্তী হয়ে হত্যা করে ডাইনী বা তান্ত্রিকদের। উদাহরন হিসেবে স্মিথ গ্রামের থ্লেন পূজারি পরিবারের তিনজনকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৯ জনকে। এই গ্রেপ্তারের মূল কারনটি হচ্ছে নিরিহ গ্রাম্বাসীর ওপর নোংশোহনোহ- কৃত আক্রমন ও পরবর্তীতে মেনশোহনোহদের তন্ত্রাচার। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে, সমস্ত ঘটনার উত্সে রয়েছে যে থ্লেন- পূজারী পরিবারের কুসংস্কারের তীব্রতা সে সম্পর্কে নীরব ভূমিকার প্রবণতা মেঘালয়ের শিক্ষিত সমাজের একটি বড় অংশের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। থ্লেন এর অস্তিতে বিশ্বাস- অবিশ্বাস স্বতন্ত্র প্রশ্ন কিন্তু কিছু সংখ্যক মেনশোহনোহদের চাহিদা- পূরণের শর্তে মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্নটি অবান্তর হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর তাই স্মিথ গ্রামবাদের তান্ত্রিক পরিবারকে হত্যা কোন কুসংস্কার- জাত নয় ,সেই পরিবার- কৃত নৃশংসতার বাস্তবতাই হত্যাকান্দের মূল কারণ, কুসংস্কারের দায়ভার এখনে মেনশোহনোহ পরিবারের। এই তন্ত্রাচার যেহেতু মনোবিকলনের বহিঃপ্রকাশ সেখানে আইন প্রনয়ন করে তা দূরীকরনের প্রশ্নটিও অবান্তর হয়ে পড়ে। মেঘালয়ে এইসব থ্লেন পূজারীদের কাছে নানা সমস্যার সমাধানের জন্য শরণাপন্ন হন সমাজের শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত নানা পেশার মানুষেরা। তাদের বিশ্বাস , লোভ, কুসংস্কারকে কেন্দ্র করেই থ্লেনের সক্রিয়তা।স্মিথ গ্রামের প্রতিবাদী জনগণের কার্যকলাপ যেমন সমর্থনযোগ্য নয় , তেমনি মেনশোহনোহদের আদিভৌতিক কার্যকলাপের বাস্তবতাও অনস্বীকার্য নয়। শিক্ষিত তথা প্রগতিশীল সমাজের এই বাস্তবতা স্বীকার করে সেই সমস্ত পরিবারকে চিহ্নিত করাই হতে পারে এই কুসংস্কার দূরীকরণের প্রথম পদক্ষেপ এবং তারপর নৃশংশ ঘটনা ঘটার পর গণ- প্রতিবাদের অপেক্ষা না করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সম্ভব হতে পারে অবস্থার উন্নতিকরণ বলে মনে হয়।

খাসিরা যেহেতু জুম- কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠী তাই অন্যান্য কৃষিভিত্তিক সমাজের মত সাপ তাদের কাছে উর্বরতা, উত্পাদনের সাথে সংপৃক্ত থাকাই স্বাভাবিক। বিশ্বের প্রায় সমস্ত সভ্যতা, সংস্কৃতিতে সাপের যে মোটিফ প্রচলিত তাতে শুভ এবং অশুভ দুটি প্রতীকেরই দেখা মেলে। থ্লেনের কাহিনিতে আমরা দেখি সমাজের পক্ষে অশুভ বা ক্ষতিকারক থ্লেনকে ধ্বংশ করে তার চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট না রারখার সামাজিক দলবদ্ধ প্রয়াস। পরবর্তীতে থ্লেন এর পুনরুজ্জীবন এবং বৃদ্ধা মহিলার তাকে আশ্রয় দান। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং ছোট্ট সাপকে আশ্রউ দান –যে সাপ কৃষিনির্ভর সমাজে উর্বরতার প্রতীক। লোককথা যেহেতু মৌখিক সৃষ্টি এবং মৌখিক পরম্পরাতেই তার প্রান প্রবাহ তাই মূল কাহিনীতে সময়ের ব্যবধানে নানা উপাদান, রীতি , পদ্ধতি সংজোযিত হতেই পারে। তন্ত্রাচারের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রোযোজ্য। কারণ অনেকের মতেই থ্লেনের মূল কাহিনীতে নোংশোহনোর উপস্থিতি ছিল না। পরবর্তীতে থ্লেন কে কেন্দ্র করে তান্ত্রাচারের আগ্রাসনেই সমাজে উপস্থিতি নংশোহনোহদের।আর তাই আত্মগত শুভ অশুভ শক্তির যে বিস্বাসটি লোককথার মাধ্যমে খাসিদের মধ্যে প্রবহমান তার মধ্যে অশুভ থ্লেন স্তিমিত হবার অবকাশ পায় না। মেঘালয়ের সহজ সুন্দর প্রকৃতির কোলে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকা পাহাড়ি মানুষ,যারা একসময়ে শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজনে নর শিকারী ছিল তাঁরা জীবন ধারন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করেছে নরমুন্ড শিকার কিন্তু সেই পরম্পরাটি প্রবহমান রয়ে গেছে একুশ শতকের আধুনিক মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সীমাহীন চাহিদার শর্তে। আর তাই আজো থ্লেন পূজারীদের আতংক তাড়া করে সাধারন খাসি মানুষদের। নংশোহনোহদের ভয়ে সন্ধ্যের পর একা বের হয়না বাড়ি থেকে, সঙ্গে রাখে একমুঠো চাল, অপরিচিতদের স্পর্শ করতে দেয় না তাদের মাথার চুল। ১৪ আগষ্ট ২০১৩ স্মিত গ্রামে থ্লেন পূজারিদের হত্যা মেঘালয়ে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়–আরো অজস্র অন্ধবিস্বাস , কালোজাদু চর্চায় বলির পরম্পরা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চলে আসছে এই রাজ্যে । আর এই অন্ধবিস্বাস যখন একাকার হয় মানুষের লোভের শীর্ষবিন্দুতে, তখন থ্লেন এর সর্বগ্রাসী রূপ খাসি গোষ্ঠী- জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে প্রতীকায়িত করে চলে বর্তমান বিশ্বের সানস্ক্রীন চর্চিত সভ্যতার আড়ালে সযত্নে রক্ষিত নখ-দন্তধারী মানব জীবনের গোটা অবয়বটিকে ।

তথ্যসূত্রঃ

১) সুরমা বরাকের রাজনৈতিক ভূগোলের বিবর্তনঃঔপনিবেশিক পর্ব, বিবেকানন্দ মহন্ত।
২) জীব জগতের লোকশ্রুতি, সমরেন্দ্রনাথ চন্দ।
৩) শ্রীহট্ট কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, সুজিত চৌধুরি।
৩) *Folk Tales of Assam,* by Mira Pakrasi.
৪) *Myth and Reality,* by D.D.Kosambi
৫) *Cachar under British Rule in North-East India,* by J.B. Bhattacharjee.

মৌখিক সূত্র:

ডোনাল্ড টেরন, এলভারতী, ওয়াই রাসবিহারী সিং, বিবেকান্নন্দ মোহন্ত ।

মেঘমালা দে মহন্ত, নেহরু কলেজ, কাছাড়, আসাম. Email: deymeghamala@gmail.com